যায়যায়দিন

তারিখ 03 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে বছরে প্রয়োজন ৭০০০ স্কুল

এম মামুন হোসেন

২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে প্রতি বছর নতুন করে সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য চারজন শিক্ষক দিতে গেলে সরকারের অতিরিক্ত আরো তিনশ কোটি টাকা দরকার হবে। এছাড়া প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই যে ২২ লাখ শিশুর ঝরে পড়ে তা রোধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে। সব মিলিয়ে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে বর্তমান সরকারকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদরা। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। এ হিসাবে প্রতি বছর যে বিপুলসংখ্যক শিশু জন্ম নেয় তাদের শিক্ষার জন্য প্রতি বছর নতুন প্রায় সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইজ) তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৭ হাজার ৬৭২টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯ হাজার ৯৯৯টি, নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয় ১ হাজার ১৪০টি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পৃ১০ ›› ক১

দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

২৩ হাজার ২০৯টি।

মানব উন্নয়ন সূচক এবং গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশ। আবার ইউনেস্কো ইন্সটিটিউট অফ স্ট্যাটিসটিকস, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে ৫৪ শতাংশ পুরুষ ও ৪১ শতাংশ মহিলা। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর। সাক্ষরতার হার অনুযায়ী এখনো দেশের সাড়ে চার কোটি মানুষ নিরক্ষর। নতুন সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত দেশ গড়তে চাইলে আগামী ছয় বছরের মধ্যে সাড়ে চার কোটি মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হবে।

বর্তমানে দেশের ১৯ হাজার গ্রামের একটিতেও বিদ্যালয় নেই। দেশের উপজেলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ উপজেলায় নেই কোনো সরকারি হাই স্কুল। ব্যানবেইজের তথ্য থেকে আরো জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৫৮:১। আর রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৬ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক।

এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর মোজাফফর আহমদ যায়যায়দিনকে বলেন, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাত মিলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি, বাজেটে এ ফাঁকিটা বন্ধ করতে হবে। প্রকৃতভাবেই শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিতে হবে। পথশিশু, হতদরিদ্র, চরবাসী এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই এর বেশিরভাগ ঝরে পড়ছে। সরকারকে এ কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। ভর্তির পর প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ করার আগ পর্যন্ত এদের টিকিয়ে রাখতে হবে। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রয়োজনটা সরকারকে অনুধাবন করতে হবে।

তার মতে, কয়েকটি বিষয় যেমন স্কুল, পরিবেশ ও শিক্ষক এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। সম্ভাব্য ঝরে পড়াদের কাছে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে চারজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও দেশের বেশ কিছু স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চালানো হচ্ছে। এ সঙ্কট মোকাবেলা করতে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক দিতে সরকারের আরো তিনশ কোটি টাকা দরকার হবে। ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক, স্কুল কমিটিকে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মনিটরিং করাতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষকদের পাঠদানের পাশাপাশি সরকারের অনেক কাজ করতে হয়। এছাড়া শিক্ষকরা কোচিং ব্যবসা নিয়ে অনেকটাই ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষাদানে এসব প্রতিবন্ধকতা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সঠিক ও যুগোপযোগী। তবে তা বাস্তবায়ন করতে সরকারকে অবশ্যই দুর্নীতি কমাতে হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত করতে আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। এখানে জরুরি হলো স্কুলে ভর্তির পর ঝরে পড়ার হার রোধ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল নির্মাণ করতে হবে। স্কুলে মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কি না তা বর্তমান সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি মনে করেন, বিশেষ করে স্কুলগুলোর ম্যানেজিং কমিটিকে আরো গতিশীল করতে হবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি কয়েকটি বিকল্প পন্থা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্পদের প্রয়োজন। দেশের সম্পদের আরো সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্কুলগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। দেখা যায়, বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকালের পর আর বিকালে ব্যবহার হচ্ছে না। এর ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সমন্বয়ে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতি বছর শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয় তা সঠিকভাবে কাজে লাগালে খুব সহজেই সরকার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

এদিকে বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল এবং ঢাকার প্রতিটি থানায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষা উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনার কথা সরকারের ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়।